Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 111 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 111 – 118
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কমলকুমার মজুমদারের ‘শবরীমঙ্গল’ ব্রাত্যজীবনের কাহিনী হলেও ঈশ্বর লাভের আড়ালে মানব অন্বেষণ : একটি আলোচনা

ভগীরথ নন্দী
গবেষক, বাংলা বিভাগ
রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি
Email ID: nandibhagirth5@gmil.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Shabrimangal, Bratya jibon, Iswarlav, Manab Anweson, Kamalkumar majumdar, Madhali, Romni.

Abstract
Kamalkumar Majumdar's novel ‘Shabrimangal’ travels outside the conventional way of thinking but does not seem to have created any disturbance in the flow of the story. It is foolish to form any idea about the novel by reading the plot of this novel. In particular, he has always emphasized the emotional side of the subject. The religious sense of the tribal people and the idea of God can be said to be the source of the author's novel Bratyjan. Khandit establishes characters like Madhali within the fragmented novel, who have a sense of correctness, ‘the tension of lust and ultimately the search for humanity. The diverse life-views of the characters depicted in the novel and their conflict through Kamalkumar's wonderful variety of forms, rhetoric and language style. The story of the novel revolves around the religious faith of Madhali, a young man of the Nishad tribe, and the love dilemma of a Jhumurwali named Romni. However, along with that came the topic of appearance. Although the story of the novel is fragmented, one thing is clear, the beginning of the story through Madhali and Romni’s memory romance. Madhalie fell in love with Romni on her first night. In search of God, I can see in the second part of the fragmented part how much Madhali is in love with God. In fact, the subject that Kamalkumar has adopted in the novel can be said to be not only Madhali's search for God but also the journey of a person's psyche. Its origin extends from Kasundihi village to Raivati village i.e. from Romni’s house to Madhli’s house. Throughout the novel, the author has shown a religious agenda, yet above all, human love has returned. In search of God, as his course has changed time and again, various events of the mundane world can be found. Not only God but also the Collector, the constables, their oppression turned the joy of the Christian natives into sorrow. Along with this, incidents like killing Bilati Saran in connection with their land occupation also happened. Although Madhali’s birth was immersed in the sea of sorrow, she was not wandering around in search of God as much as in search of food, but in search of God, she repeatedly saw the face of Shabar Balika in front of her eyes. Although the beginning of the story of Sabarimangal begins with the darshan or search for God, it ends with the human search. Where the Mundas, who could

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 16
Website: https://tirj.org.in, Page No. 111 - 118
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

not find food, abandoned the search for miraculous ways and turned themselves into God-fearers. From beggars to ordinary people, they have given up the search for eternal life and realized life by standing on the ground of reality. From this, the criteria of sin and virtue in the company lord, Batadar Mahajan, Brahmin Thakur finally led Madhali to a new understanding of sin and virtue. Hunger, poverty, the Mundas have removed themselves aesthetically from the social structure and sought their own existence, they felt happy. In the end Madhali went out to search of Human bing.

Discussion

কমলকুমার মজুমদার নামটি বাংলা সাহিত্যে কতটা আপেক্ষিক তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাঁর রচনা শৈলীর মৌলিকতা বহু পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন তবুও তাঁর রচনার কাহিনী ও বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্যতা দেখিয়েছেন সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করা যায় –

> “গল্প-উপন্যাসের বিষয়ের প্রতি কমলকুমারের নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর রচনায় এনেছে মননশীলতার দাঢ্য। শুধু নৈর্ব্যক্তিকতা নয়, গল্প-উপন্যাসের বিষয়ের সঙ্গে লেখকের একাত্মতা ঘটে উচ্ছ্বাসের এবং ভাবাবেগের স্রোতে নয়, জীবনের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগই এই একাত্মতাবোধের কার্যকারণ।”[১]

এ থেকে একটি বিষয় সহজেই বলা যেতে পারে কোনো শিল্পী তাঁর দেশ-কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক পরিবেশের মধ্য থেকে আপ্ত অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে সৃষ্টি করেন এক সাহিত্য। কমলকুমার এমন এক ধারা সৃষ্টি করে গেলেন যাতে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর নির্মম ও নিরাশক্ত রূপ স্পষ্ট। ব্রাত্যজনের রূপকার কমলকুমার ছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে সামন্ত তান্ত্রিক। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি তাই যথার্থভাবে জীবন অভিজ্ঞতার ফসল হিসেবে আমরা পেতে অভ্যস্ত। তবে আলোচ্য ‘শবরীমঙ্গল’ উপন্যাসটি কিছুটা ব্যতিক্রমি। তার কারণ হিসেবে উল্লেখ করতে হলে উপন্যাসের ভুমিকা অংশে পত্নী দয়াময়ী মজুমদারের বক্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন -

> “লেখক শ্রীকমলমুমার মজুমদারের ‘শবরীমঙ্গল’ উপন্যাসটির রচনাকাল সম্ভবত ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ মধ্যে। ‘শবরীমঙ্গল’ লেখকের প্রথম দিকের রচনার অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি আদিবাসী জীবনের কাহিনীকার।
>
> লেখকের প্রয়াণের পর ‘শবরীমঙ্গল’ উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি যখন আমার হাতে ফিরে আসে তখন লেখাটির অর্দ্ধাংশ মাত্র পাই। শবরীমঙ্গল একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস ছিল, অপ্রাপ্ত অংশগুলি বাদ হয়ে যাওয়ার ফলে এর ভাবধারাকে বজায় রেখে প্রকাশ করার পক্ষে অসুবিধে দেখা দেয়। তবুও লেখার আপাতত বিন্যাসকে লক্ষ্য রেখেই সামান্য সংযোজনার কাজ আবশ্যক হয়।”[২]

এই আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ব্যক্তি কমলকুমার মজুমদারের উপন্যাসচিন্তা কেমন ছিল সে বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা এই উপন্যাসটি সম্পর্কে নানান সমালোচক বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। অনেকে এমন অভিযোগ ও করেছেন যে কমলকুমারের রচনা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই উপন্যাসটি তেমনভাবে প্রতিষ্ঠিত নয় যাতে মনে হতে পারে কমলকুমারের নিজস্ব সৃষ্টি। আসলে-

> “প্রবল স্বতন্ত্র্যবোধ, সূক্ষ্ম শৈল্পিক অভিরুচির সাথে সাথে অধীতবিদ্যা এবং শিল্পের প্রায় সকল শাখায় অভিগমনের ফলে কমলকুমার মজুমদারের শিল্পচিন্তা স্বভাবত হয়ে উঠেছিল বহুমাত্রিক।”[৩]

শুধু তাই নয়, প্রখ্যাত কমলকুমার মজুমদার সমালোচক শোয়াইব জিবরান প্রথম পর্বের দুটি উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন-

> “এ পর্বের প্রথম উপন্যাস শবরীমঙ্গল রচনার সময় কমলকুমার সাহিত্য চর্চাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন বলে মনে হয় না। তখন তিনি তাঁর প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে নাটক ও চলচ্চিত্রকেই মূলত গ্রহণ করেছেন। ...সাহিত্যের এ প্রাথমিক অভিজ্ঞতা নিয়েই শবরীমঙ্গল উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। উপন্যাসের বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছেন শৈশবে কৈশোরে দেখা রিখিয়ার আদিবাসী জীবন। ...ফলে উপন্যাসটি তাঁকে প্রার্থিত সাফল্য এনে দিতে পারেনি, নেহাৎ প্রস্তুতির মুসাবিদা হয়ে রয়েছে।”[৪]

কমলকুমারের বিতর্কিত এই উপন্যাসটি সম্ভবত রচনার দিক থেকে প্রথম বলা যায়। কেউ কেউ একে উপন্যাসটিকে 'বাংলা কথাসাহিত্যে কমলকুমারের এক আদি বিস্ফোরণ' বলেও উল্লেখ করেছেন। তাই উপন্যাসটির গুরুত্ব যে একেবারে ফেলনা নয় সে সম্পর্কেও কেউ কেউ বলেছেন-

> "শবরীমঙ্গল বাংলা উপন্যাসে কমলকুমার মজুমদারের আরও একটি মৌলিক যোজনা, তাতে সন্দেহ নেই। সমঝদার পাঠকসমাজের জন্য এ এক মূল্যবান সুসমাচার।"[৫]

আবার কমলকুমার মজুমদার জীবনীকার এই উপন্যাসকে বর্জন করার কথা বলেছেন, তাঁর ভাষায়- "কমলকুমার উপন্যাস-সাহিত্য আলোচনায় এ রচনাটিক বর্জন করাই শ্রেয়।"[৬] বহু বিতর্কের মাঝেও উপন্যাসটি আদ্যপান্ত অনুধাবন করে দেখা যায় হয়ত কমলকুমারের ঢং উপন্যাসের সর্বত্র নেই তবু একথা বলার উপায় নেই যে আমরা কমলকুমারের রচনাশৈলীর বহু বৈশীষ্ট্য লক্ষ্য করেছি যাতে কাহিনীর বিন্যাস, চরিত্র চিত্রণ, ভাষা ইত্যাদি বিষয়গুলো কমবেশি উপন্যাসটিতে বর্তমান। সুতরাং কমলকুমারের উপন্যাসগুলির মধ্যে শবরীমঙ্গল উপন্যাসটি আলোচনার দাবি রাখে এবং উক্ত প্রবন্ধটিও তারই প্রয়াস বলা যায়।

উপন্যাসটির ভুমিকা অংশের সূত্র ধরে আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় আদিবাসীদের জীবন কাহিনী যে প্রতিপাদ্য বিষয় তা কিন্তু নয়। এর সাথে রয়েছে মানব জাতির অন্দরমহলের বিচিত্র জীবন কাহিনী। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মতামত-

> "উপজাতি জীবন উপন্যাসটির উপরিতলে ভাসমান ফেনা, কিন্তু উপন্যাসটির গভীরতলে টগবগ করে ফুটছে ব্রাত্যজনের জীবন জিঞ্জাসা, লোকায়ত ধর্মবোধ, কাম ও ধর্মচেতনার দ্বন্দ্বজর্জর উত্তাপ। চূড়ান্ত বিবেচনায় কমলকুমার লোকায়তজনের ঈশ্বর-উপলব্ধির দার্শনিক চেতনা উপজাতীয় ব্রাত্যজনের জীবন অবলম্বনে রূপাহিত করেছেন এ উপন্যসে। উপন্যাসের নাম শবরীমঙ্গল। উপন্যাসের শবরী আছে, আছে তাদের নিয়ে রচিত মঙ্গলকাব্য, কিন্তু তার আড়ালে আছে গভীর তলশায়ী ধর্মমঙ্গল, ধর্মকে, ঈশ্বরকে উপলব্ধির কাহিনী।"[৭]

কমলকুমার মজুমদারের শবরীমঙ্গল উপন্যাসের কাহিনী আদিবাসী জনসমাজের বিচিত্র কাহিনী সম্ভার হলেও আদিবাসী নারী রোমনির প্রতি ক্রিশ্চান যুবকের ভালোবসা টান ও সেই সঙ্গে ঈশ্বর লাভের আকাঙ্খাও দেখা যায়। পাঠক কূলকে মাঝে মাঝে দ্বিধার মধ্যেও পড়তে হয়েছে উপন্যাসের মূল উপজিব্য বিষয় সঠিকভাবে কি তা, জানার জন্য। রোমনি মাধালিকে উপেক্ষা করায় তার মধ্যে আর এক নতুন পথের সন্ধান সে পেয়েছে যেখানে এক স্বর্গিয় আলোর সন্ধান অর্থাৎ ঈশ্বর লাভের বাসনা। উপন্যাসটিতে দেখা যায় মানুষের জাতী বর্ণ নির্বিশেষে বর্ণবৈষম্যের ফলে নিজ অস্তিত্ব মুছে গিয়ে প্রধান হয়ে উঠেছে মনুষ্যত্ব। লেখকের ভাষায়-

> " 'আমি এখানে বসে ছিঃ' এই কথাই তার বার বার মনে হল, 'আমি তাকে খুঁজব, না আমি এখানে'। এতক্ষন ধরে মনে হচ্ছিল তার দরকার নেই সে আলোর, সে স্বর্গের আলোর, সে সহজ হবে, সহজ হয়েই বাঁচবে। কিন্তু আবার মনস্থ করল- "আমি তাঁকে খুঁজে বার করবই। এ জায়গা অতি অন্ধকার, এ জায়গার হাত নেই পা নেই পাখির বাসার মত অনড়, বাঘের গুহার মত- হাওয়া এখানকার অত্যন্ত পাথর। সত্যি বড়ো অন্ধকার, এর থেকেই সেই স্বর্গের আলোই ভালো। এই সূত্রে ক্ষণেকের জন্য রোমনির কথা মনে হয়েছিল, আলোর মত সে ও দারুণ ভারী। যে রোমনি আপেল নয়, যে রোমনি ঝুমুরওয়ালী নয়, যে হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচে হয়ত।"[৮]

এই কথা ভাবতে ভাবতে যখনই মাধালি সুদীর্ঘ, সুপুরুষ অদ্বৈত মিশ্রকে দেখেছে তখনই নিজের অজান্তে বলে উঠেছে 'ঠাকুর'। ঠিক একটু পরেই তার সম্বিত ফিরে পেয়েছে যখনই কুষ্ঠরোগী অদ্বৈত মিশ্র তাকে জাত তুলে কথা বলেছে এবং রোমনির সাথে তার সম্পর্কের কথা বলেছে। সেই মুহূর্তে রোমনির আগমন ঘটায় অদ্বৈত মিশ্র একটু থেমেছে যদিও রোমনি তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে -

> "ও আমার বামুনরে, অত যদি বামনগিরি ত গঙ্গাড়ী হওগা। লয় কাশীবাসী হও!"[৯]

অপমানিত বোধ করে উত্তরে অদ্বৈত মিশ্র বলেছে -

> "যাবই ত তোর ভরসায় আছি নাকি, তোর হাতে খাই বলে কি ভাবিস? অনেক পুণ্যের ফলে বামুন হয়।"[১০]

নিজের ব্রাহ্মণ জাতের অহংকার মাধালিকে ভস্মিভূত করে দিতে চায়। রোমনির মা তার পা ধোওয়া জল খেত বলে সে নিযেকে ভীষণ গর্বিত অনুভব করে। এখানে সে অদ্ভূত যুক্তি খাড়া করেছে আগের জনমে বামুণের মেয়ে হওয়ায় রোমনির মা তার সঙ্গ পেয়েছিল। কিন্তু কমলকুমার মানুষের অন্তরের কথা বের করে সন্তর্পনের সমাজের এই ধরণের মানুষের অন্ধকার দিকটিকে উন্মোচন করেছেন। পাশাপাশি আদিবাসীদের জীবন যাত্রার কথাও উল্লেখ করে রোমনির দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কথা তুলে

ধরেছেন। ‘লবাবুর মেয়ের সাদ’ উপলক্ষে গাড়ি এসেছে তাকে নিয়ে যেতে অথচ সে শারীরিক ভাবে সবল নয় বলে যেতে অস্বীকার করে। ‘শরীর লায়েক লয়-’।

কমলকুমার চিত্ররূপকার তাই তাঁর রচনায় প্রকৃতির চিত্র থাকবে না তা হতে পারে না। তবে তা চরিত্রের সমন্বয়ে গঠিত। তার একটা বর্ণনা পাই-

> “হুড়তির রাস্তায় শাল গাছ-তলা, দুদিকে দুটি বিরাট আকাশ, এখানে একা বসে থাকা এবং ভিক্ষা করা। লাল রাস্তা শুধু চলে গেছে, কখন লোক যায়। যারা রকমারি কাজে যায় তারা এটা সেটা দেয়, কখন ধুলা উড়ে কখন পাতা পড়ে, কখন পাখি ডাকে।”[১১]

এই বর্ণনার পাশাপাশি তাদের জীবনের বিচিত্র ঘটনা উপন্যাসে সঙ্গবদ্ধ করেছেন। মানুষের মধ্যে জৈবিক প্রবৃত্তি থাকবে তা ভীষণই স্বাভাবিক ব্যাপার কিন্তু এখানে অবৈধ সম্পর্কের ছড়াছড়ি। রোমনির মা এর সাথে বৃন্দাবন চাটুজ্যে ও হাজরেবাবুর সম্পর্কের সাথে সাথে অদ্বৈতের হাতে রোমনিকে তুলে দিয়ে যাবার মত ঘটনা সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। এই রোমনিই রৈবতী গ্রামের মাধালি কিস্কুর সাথে সম্পর্কের আড়ালে এক বৃহত সরলতার কাহিনী নেপথ্যে অঙ্কন করেছেন লেখক। ঈশ্বর লাভের আশায় মাধালি যতটা ব্যাকুল হয়েছে ঠিক ততটাই পার্থিব জগতের টানকে ধরে রেখেছে রোমনির প্রতি তার প্রেম। এর কারণ হিসেবে লেখক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন-

> “সর্বপ্রথম তার মনে হল, এই মেয়েটার হাত ছাড়াতে হবে, অবশ্য সে যদি স্পষ্ট করে ভাবত তাহলে সে নিশ্চয়ই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হত যে, মেয়েটির খুব একটা দোষ নেই। মাধালির নিজেরই একান্ত প্রয়োজনে সে এসেছে। প্রথম রাত্রে সে এখানে হঠাৎ এসে পড়েছিল এবং পরে ধানক্ষেতে মাধালি রোমনিকে খুঁজেছিল। ধান ক্ষেতে যদি নাই পেত তাহলে একথা স্বীকার করতেই হবে যে মেয়েটিকে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করত, কারণ তার এই পৃথিবীতে ফিরে আসার চাবিটা একমাত্র ওই মেয়েটির হাতেই ছিল।”[১২]

দারিদ্র্য আর ভালোবাসার দ্বৈত টানাপোড়েনে রোমনির জীবন অতিবাহিত। সামাজিক অবক্ষয় মানুষকে কতটা আতঙ্কিত রাখে তার প্রমাণ পাই ভাতের মাড় ফেলার ঘটনায় যেখানে অদ্বৈত মিশ্রের মত মানুষেরা অন্ন চিন্তার কালো মেঘ দেখেছে। রোমনির বাড়িতে যখন সবাই মিলে খেতে বসেছে তখনকার বর্ণনায় কিন্তু কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-ক্রিশ্চান কোনো ভেদাভেদ নাই। সবাই তৃপ্তি ভরে খেয়েছে তার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়-

> “জটা ভদ্রতা করে একটি বাঘ-ডাক ঢেকুর তুলে বললে- ‘উঃ বড্ড দম সাম হল।’... ‘ত মিছাই বলব না গো, দুটা চিবুতে দিলেই আমরা কুকুর হই গো, অধর্ম বলবো না সামনে বামুন আছে।’ ”[১৩]

কাহিনীর ক্রম প্রসারতায় দেখা গেছে মাধালি ও অদ্বৈত দুজনের কাছে ঈশ্বরই মুখ্য কিন্তু দুজনের পথ আলাদা। রোমনির প্রেম মাধালির সাথে যেমন লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছে তেমনি ঈশ্বর দর্শনের তাগিদ নিয়েও মাধালি ঘুরে বেড়িয়েছে যত্রতত্র। কিন্তু উপন্যাসের বিষয় ঈশ্বর শুধু নয়, সামাজিক পার্থিব জগতের নানান সমস্যাসহ ঘটনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন লেখক। তাদের আনন্দ ঘন মুহূর্তে স্বৈরাচারী কালেক্টর ও দারোগা মিলে আদিবসীদের জীবনে তাদের পবিত্র ছাতা পরবে যে বর্বরোচিত নিপীড়ন করেছে তাতে যেন উৎসবের আনন্দ ম্লাণ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয় নারীদের অপহরণ করে লুঠতরাজ ও চালিয়েছে। ঈশ্বর এখানে চোখের সামনে না থাকলেও মর্ত্য-মানব তথা শাসকদলের যে আচরণ লক্ষ্য করা যায় তাতে অসহায় মানুষের আর্তি নব জন্মের প্রকাশ ঘটায়। সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যতার চরম পরিণতি দেখি এই অংশে, যেখানে লেখক জানিয়েছেন-

> “আমাদের খাবার নাই কিছু নাই- আবার এই দুখ্ কেনে - আমার ভিতরে কুকুর সেন্দাইছে- কার্তিকের কুকুর মত”[১৪]

এ কথা যখন কোন মানুষ বলতে পারে তখন তার পরিণতির কথা আমরা সহজেই অনুভব করতে পারি। জ্যান্ত ব্যাঙ খেয়ে যারা দিন গুজরাণ করে তাদেরকে যে কোলিয়ারীর বাবু থেকে মহাজনেরা কুলি-মজুর ভেবেই ক্ষান্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। মাধালি ঈশ্বর দর্শনের জন্য বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত থেকে শুরু করে গুহা সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছে এবং শেষে ক্লান্ত হয়ে জীবনের স্রোতে ফিরে এসেছে তাতে ইতিহাসের কেবল পুনরাবৃত্তিটুকুই ঘটেছে বলা যায়। সমাজের উচ্চ শ্রেণির কাছে আদিবাসীরা কেবল-

> “এরা শুধু কাজই করবে, ভার বইবে, এরা কুলি বই অন্য কিছু নয়। মেম সাহেবরা নাকে রুমাল দিয়ে এদের পাড়ায় আসে, ভালোবাসা জানায়, এরা খুসী হয়ে মাদোল বাজায় সারাদিন খুসী মনে উপোস করে “পেট না ভঁরল মন ভঁরল হে।”””[১৫]

লোচন দাসের দাপটে এক কোঁড়ার জমি মাত্র আট টাকায় বিক্রি হয়ে যায়। তাদের অসহায় অবস্থার সময় পাদরি সাহেব মাধালিকে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে বলে। কিন্তু মাধালি ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন হতে পারেনি। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে শবর বালিকার মুখ। ফলস্বরূপ দারিদ্রতার চরম অসহায়তা, ঈশ্বর ভক্তি ও প্রেম এর মিশ্রণ গড়ে উঠেছে। ভূস্বামীরা তাদের পার্থিব প্রতিপত্তির বাসনায় কাজ করিয়েও আদিবাসীদের নকল টাকা দিয়েছে এমনকি সেই নকল টাকা থেকেও অনেকে বঞ্চিত। ফ্রান্সিস যখন এই প্রতারণার কথা তুলেছে সুবাইয়ের কাছে তখন নানান কথার মাঝে আদিবাসীদের ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসার নামে সাধারণ মানুষকে ঠকানোর যে প্রচেষ্টা এবং তা সাধারণ মানুষ কিভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে তার উল্লেখ করতে হয় -

> "তুমি তাদের কিছু কর নাই আর তোমায় মারলে? তুমি চেয়েছিলে কলিয়ারীতে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যেতে, বুড়ীদের বলেছিলে, ওপারে কাশীধাম, মরলে স্বর্গে যাবে। এখানে গিধনিতে খাবে।"[১৬]

ঈশ্বরের কথা প্রসঙ্গে জানতে গিয়ে প্রভু যিশুর কথা পাদরি বাবার কাছে জানতে চেয়েছে। অন্যদিকে বিলাহী যিশুর প্রতিমূর্তী বানিয়েছে তাতে মাধালি ঈশ্বর কে খোঁজার চেষ্টা করলেও বিলাহী কিন্তু যিশুর কাছে শুধু চাইবে -

> "আমি দেখা হলে এক জোড়া বলদ চেয়ে লুব, এ বিঘা নিস্বর, বেশী লয়- বড় কষ্ট আমার হে-"[১৭]

আসলে চরম দারিদ্রতা ও অসহায়তার মধ্যে সাধারণ মানুষ ঈশ্বরকে তাদের অভাব অভিযোগের রক্ষাকর্তা হিসেবে মনে করে থাকে। অন্যদিকে মাধালি ঈশ্বরকে লাভের আশায় ভেবে রাখা পাত্রী দুখাড়ার বোনকে বিয়ে করতে অস্বীকৃত হয়। যেখানে প্রভু যিশু তাঁর শিষ্যদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন আর এখানে মুণ্ডারা তো সাধারণ মানুষ। মাধালির ঈশ্বর সন্ধান নিয়ে অনেকে কটাক্ষ যেমন করেছে তেমনি আবার অনেকে তার বোন লুহানীকে পাওয়ার জন্য বিবিধ কর্মকাণ্ড ও করেছে।

> "প্রত্যেকেই লুহানীর স্যাঙা করা নিয়ে অনেক ভেবেছে, নিজের হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে অল্প অল্প দুলেছে আর ভেবেছে, আবার নতুন করে সংসার। কেউ ভেবেছে যদি ভাল দুচারটা গীত জানতাম, চার্চের গান নয়, কেউ ভেবেছে যদি বাঁশী জানতাম ... কেউ কেউ তার আশপাশ দিয়ে যাবার সময় গান গেয়ে উঠেছে, গানটার মধ্যে কুঞ্জবন ছিল, সাজানোয়া ছিল, কেউ কেউ বাঁশী বাজাবার চেষ্টা করেছে,..."[১৮]

এই স্থান থেকেই উপন্যাসের কাহিনীতে মাধালি চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন দেখা গেছে। তার অন্তরে সে উপলব্ধি করেছে তার ভেতরে কিছু নেই সে যেন একটা কুকুরকে বয়ে বেড়াচ্ছে। আসলে এই কুকুর হল কামতৃষ্ণা। সমালোচকের মতে -

> "এরপর মাধালি চরিত্রের দ্বিধা থাকেনি, অবিরাম জগতের প্রেমের ছুটে চলা। জৈবিকতাকে স্বীকার করে নেওয়া। এর পর থেকে মাধালি তার চারপাশের প্রকৃতির ভেতর দেখতে পেয়েছে কামের চিহ্ন, ক্ষুধার তৃষ্ণার রূপ।"[১৯]

মাধালি চরিত্রের মধ্যে ভগবানের প্রতি আস্থা তাদের মুণ্ডা সমাজে এক আশার সঞ্চার করে। তারা ভাবে মাধালি আছে মানে তাদের ফসল পশু-পাখি যা কিছু আছে সবকিছুই ভালো থাকবে, নীরোগ হবে। কিন্তু কমলকুমার উপন্যাসটিতে শুধুমাত্র ঈশ্বর প্রেমের কথা বলেননি মানব প্রেমের কথাও বারে বারে বলেছেন। তাই গির্জায় প্রার্থনার সময় একটি মেয়েকে দেখে মাধালির রোমনির কথা মনে পড়ে। সে চোখ বন্ধ করলেও যিশু ও রোমনি দুই এর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করে। রৈবতীর দিকে যখন সে যাত্রা করেছে তখনই সে দরিদ্র বঞ্চিত মানুষদের জীবনকে উপলব্ধি করে। ব্রাহ্মণ্যবাদের ছায়া উপন্যাসের মধ্যে চোখে পড়ার মত। কায়েত সুবাই যখন হুরা মুণ্ডাকে বলে-

> "শালা ছোটোজাত কতবার বলেছি কায়েত বামুনের ঘরকে রকম আলাদা কেউ এলে শালা দণ্ডবৎ করবি। বলার সঙ্গে সঙ্গেই হাঁদা লোকটা তড়পা সহ কুর্নিশের মত বেঁকে দণ্ডবৎ করলে।"[২০]

এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন-

> "উচ্চবর্ণীয় মানুষের সামনে নিম্নবর্ণের দণ্ডবৎ হয়ে থাকার এই অমানবিক বিধান নিয়েই ভারতীয় সমাজ অক্ষুণ্ন। কোম্পানির চাপিয়ে দেয়া ভাটিখানায় নিঃশেষ হয় কুলি-কামিন্দের স্বপ্ন। ফলে সেই ভাটিখানা একদিন ভস্মীভূত হয় তাদের ক্ষোভে।"[২১]

সামাজিক ভাবে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার আদিকালের। উপন্যাসটিতে মাধালি ঈশ্বরকে বনে-জঙ্গলে খুঁজে বেড়িয়েছে কিন্তু তার তো কোন প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না কারন বাড়িতে থেকেও তো ঈশ্বরের প্রার্থনা করা যায়। তাই যখন তাকে এই কথা বন্ধু পরান বলেছে তখন সে বাড়িতে ফেরার কথা ভাবলেও হুড়তীর রোমনির কথা বার বার মনে আসে। তাই সেই গ্রামে যেতে চাইলে দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছে বেলাড়ীর রাস্তায় সাঁওতাল রমণী কিভাবে গয়ালী পাণ্ডার দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছিল। এই ঘটনা তাদের জীবনে কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। হুড়তী গ্রামের মুণ্ডা আদিবাসীরা মাধালীকে ঈশ্বর

সন্ধানের প্রতিভু যেমন ভেবেছে তেমনি বোন লুহানী ও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। কারণ আজ তার অস্তিত্ব নানা ভাবে বিপন্ন। আসলে মাধালি উপন্যাসটিতে যেমন যিশুর সন্ধান করেছে তেমনি ভগবান শুধু নয় অত্যাচারিত নিপীড়িত মুণ্ডাদের জাগতিক বিশ্বে স্বপ্নপূরণের জন্য ব্যাকুল আর্তি সন্ধান করেছে। তাই সবাই মাধালির আগমনে নিজ অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য উদ্‌গ্রীব।

শবরীমঙ্গল উপন্যাসটির শেষের দিকে এসে লক্ষ্য করা যায়-

> "এরা সকলেই মাধালির উপস্থিতিতে আবেগ উপলব্ধি করেছিল যদি কোন জীবনের সুরাহা হয়; দাঁড়ি পাল্লা পাই আর খাজনা অভিশপ্ত দিন যদি নির্ঝঞ্ঝাট হয়। ফড়েদের জুয়াচুরির কথা ফাদারকে বললে হয় কিন্তু ফ্রান্সিস মহাজনদের বকাঝোকা করল, তারা মাল নেবে না, এমন কারো সাধ্য নেই এক হাট হাত গুটিয়ে বসে থাকে অথবা নিজেরা দূর শহরে সামগ্রী নিয়ে যায়।"[২২]

চারিদিকে ঘুরে ফিরে ঈশ্বর অনুসন্ধান করতে গিয়ে মাধালি অনুভব করেছে প্রকৃতির কোল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে শুধু মানুষ আর মানুষের জন্য মমত্ববোধ। তাই যখনই একটি ছোট্ট মুণ্ডা বাচ্চা তাকে ব্যঙ্গ করেছে তখনই তার মনের মধ্যে এক প্রতিবাদী সত্ত্বা জেগে উঠেছে। তার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে তার ঠাকুরদার বিদ্রোহী রক্ত। সমাজের বহুক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষ করেছে যারা উচ্চবর্গীয় মানুষ তারা সর্বদা অহংবোধ আর প্রবৃত্তির তাড়নায় আদিবাসীদের ভোগ করেছে। অথচ ঈশ্বর যে শুধু মাত্র ধনির ঐশ্বর্য মণ্ডিত রত্নখচিত দেবালয় বা কোম্পানির গির্জায় সীমাবদ্ধ তা কিন্তু নয়। শুধুমাত্র তাদের ভয় দেখিয়ে এতদিন অত্যাচার করেছে। বাঁকুড়ার মন্দিরে কালো পাথরের নারায়ণ মুর্তি দেখলে ভুখাইয়ের মৃত্যু হবে। আসলে মাধালির মতে মন্দির আর ভগবান গরিবের কাছে সংক্রমিত জীবাণুর মতো তাতে তাদের কোনো অধিকার নেই। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী-

> "মাধালি বুঝে গেছে ইট পাথরের চর্চিত গির্জায় তার ভগবান নেই, পথে ঘাটে প্রান্তরে দেখা মানুষের মধ্যেই হয়ত সে ভগবান যিশুর ছায়া দেখতে পায়। মাধালির ঈশ্বরদর্শনের সঙ্গে মাকড়ীর ঈশ্বর দর্শনের মিল নেই, মাধালি প্রকৃতিমুখী— মাকড়ী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক। কিন্তু সমস্ত ঈশ্বর চেতনাকে দূরে সরিয়ে অন্তিম পর্বে মানবচেতনারই নিরংকুশ আধিপত্য বহাল হতে দেখা যায়।"[২৩]

মাধালির অনন্ত জীবন কথাটির মধ্যে যে অভিশাপের ভাব প্রকাশিত হত সাধারণ মনুষের মধ্যে তাতে পাপ-পূণ্য এক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ যাদের হাঁড়িতে ভাতের চাল পর্যন্ত নেই তার কাছে এই পাপবোধের বালাই নেই। কিন্তু তাদের মধ্যে কাম পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত রয়েছে। মাধালি ও এই কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। মুণ্ডাদের জীবনের কষ্ট-যন্ত্রণা একপ্রকার সংগ্রামী জীবনের সূচনা করে। যেখানে সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল ভাবে থাকলেও তাকে বেষ্টন করে রয়েছে অসংখ্য সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষ। আদিবাসী-মুণ্ডাদের জীবনের সহজ স্বাভাবিক গতিপথে দারিদ্র্য, কাম ও প্রেম এর অবস্থান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই কমলকুমার উপন্যাসে লিখেছেন -

> "আমার শালা মেঘ ডাকলে কাম হয়, আমার শালা ব্যাঙে পোকা ধরলে হয়, ভাবলাম শালা আমিও কোথায় পোকার মত ভয় পেলে হয়, আমি মাগী চাই এ কেনে বল..."[২৪]

মাধালির এ বক্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় সে যে তার জীবনের এই চরম সত্যকে মেনে নিয়েছে তাতেই সে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পেরেছে। এর মাঝে আমাদের সমাজে অদ্বৈত মিশ্রের মত লোকেদের কেউ সহজে আপন করে নেয় না। কিন্তু উপন্যাসের শেষের দিকে দেখা যায় যে অদ্বৈতের সঙ্গে মধালির তেমন মিল ছিল না সেই অদ্বৈত মিশ্রকে আপন করে নিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। সবাই এতে বাকরুদ্ধ হয়েছে বটে তবুও পরক্ষণে প্রতিবাদ করলেও মাধালি বলেছে- 'উয়া আমার কাছে এসেছে' এতে তার মানবিক দিকের যে উত্তরণ ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। কমলকুমার উপন্যাসের কাহিনী বুননে যে প্রয়াস করেছেন তাতে মানবিক মুল্যোবোধের যে জাগরণ এখানে সূচীত হয়েছে তাতেই উপন্যাসের পরই সমাপ্তি ঘটেছে বলা যেতে পারে।

কমলকুমার মজুমদারের 'শবরীমঙ্গল' উপন্যাসে মাধালি ও রোমনির মধ্যে যে প্রেমের রসায়ন ঘটিয়েছেন তা উপন্যাসে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে বলা যায়। এখানে দীর্ঘদিন ঈশ্বর অন্বেষণের পরিবর্তে মুখ্য হয়ে উঠেছে রোমনির প্রতি মাধালির কাম ও প্রেম বাসনা। অর্থাৎ এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মাধালি ভগবানের উপস্থিতির চেয়ে মানুষকে আপন করে নেবার মধ্য দিয়েই বেশি তৃপ্ত। আদিবাসী মুণ্ডারা মাধালির জীবনে ভগবানের চেয়ে অনেক বেশি কাছের ও মনের। ঈশ্বর লাভ করতে গিয়ে যে সমস্ত সামাজিক পরিবেশের কথা লেখক অবতারণা করেছেন তাতে ঈশ্বরকে সামনে রেখে সমাজের সাধারণ মানুষকে ব্যবহার

করাই মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত মাধালি চরিত্রের মানবতার উত্তরণের মধ্য দিয়ে যে উপন্যাসিক সেই পার্থিব মানুষের আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাদের স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে চিত্রিত করেছেন তাতে মানব অন্বেষণে সমর্থ হয়েছেন এ কথা স্বীকার করতেই হয়।

Reference:

১. রফিক, কায়সার, ‘কমল পুরাণ’, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৮১, প্যাপিরাস প্রেস ১৪/এ কাঠের পুল লেন বানিয়ানগর, ঢাকা-১, পৃ. ১৬
২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, কমলকুমার মজুমদার ‘উপন্যাস সমগ্র’, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ পৃ. ৪৫১
৩. শোয়াইব, জিবরান, ‘কমলকুমার মজুমদারের করনকৌশল’, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, পৃ. ১৬
৪. তদেব, পৃ. ২৫
৫. তদেব, পৃ. ২৬
৬. আবুবকর, সিদ্দিক, ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার : তার আদি বিস্ফোরণ শবরীমঙ্গল, ফেব্রুয়ারি ২০০০ সংস্করণ, ঢাকা, পৃ. ১৩
৭. শোয়াইব, জিবরান, ‘কমলকুমার মজুমদারের করনকৌশল’, প্রথম প্রকাশ জুন ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, পৃ. ৩০
৮. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, কমলকুমার মজুমদার ‘উপন্যাস সমগ্র’, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,, কলকাতা ৭০০০০৯ পৃ. ৪৫৪
৯. তদেব, পৃ. ৪৫৫
১০. তদেব,
১১. তদেব, পৃ. ৪৫৬
১২. তদেব, পৃ. ৪৫৮
১৩. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১৪. তদেব, পৃ. ৪৭৭
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭৯
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮৩
১৭. তদেব, পৃ. ৪৮৯
১৮. তদেব, পৃ. ৫০৩
১৯. শোয়াইব, জিবরান, ‘কমলকুমার মজুমদারের করনকৌশল’, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৯, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০, পৃ. ৩৭
২০. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, কমলকুমার মজুমদার ‘উপন্যাস সমগ্র’, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল, ২০১৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, পৃ. ৫১০
২১. বোস, চঞ্চল কুমার, ‘কমলকুমারের কথাসাহিত্য ধুলায় অমৃত প্রাণ’, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২২, নবযুগ প্রকাশনী, ৬৭ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, পৃ. ৭৩
২২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, কমলকুমার মজুমদার ‘উপন্যাস সমগ্র’, সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,, কলকাতা ৭০০০০৯ পৃ. ৫২১
২৩. বোস, চঞ্চল কুমার, ‘কমলকুমারের কথাসাহিত্য ধুলায় অমৃত প্রাণ’, প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২২, নবযুগ

প্রকাশনী, ৬৭ প্যারী দাস রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ, পৃ. ৭৫

২৪. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল, কমলকুমার মজুমদার 'উপন্যাস সমগ্র', সপ্তম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১৯, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারী ২০০২, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন,, কলকাতা ৭০০০০৯ পৃ. ৫২৪